60

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 APR 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ছাত্র রাজনীতির সহজ সরল পথ

রাজনীতি হচ্ছে একসেট ধ্যান-ধারণা যার ভিত্তিতে একদল সমমনা মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণকে পরিচালনা করার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালায়। রাষ্ট্র এগিয়ে গেলে রাজনীতির ধ্যান-ধারণাও ক্রমশ বদলে যায়। রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক শিক্ষিত ও সচেতন হয়ে গেলে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য কমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দলের সংখ্যা ২/৩টির মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এ প্রক্রিয়া প্রায় সর্বত্র দেখা গেছে। যেখানে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে সেখানে এখনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা রয়ে গেছে।

আমাদের দেশে এখনও অন্তত ১২/১৩টি রাজনৈতিক দল আছে। এর অর্থ আমাদের রাষ্ট্র চালনার ক্ষেত্রে অন্তত ১২/১৩টি মত আছে। এটি একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এতে আধুনিক গণযোগাযোগ মাধ্যমগুলোর অকার্যকারিতা এবং ব্যর্থতার সঙ্গে দলাদলিপূর্ণ রাজনীতির কুটিলতা ও লালসা প্রমাণিত হয়।

আমাদের দেশে রাজনীতির জট পাকিয়ে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। আমরা প্রায় সকলে এক জাতি। আমাদের আছে হাজার বছরের অভিন্ন সংস্কৃতি। অন্যায়, অবিচার, শোষণ, বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসও এক। আমাদের বড় জোর তিনটি মত থাকতে পারত— বৈপ্লবিক উন্নতি, দ্রুত উন্নতি এবং ধীরে ধীরে উন্নতি। কিন্তু আমাদের রাজনীতি জনকল্যাণমুখিতার সরল আন্তরিক পথে যায়নি।

১৯৭১ পর্যন্ত আমাদের রাজনীতির গ্রাফের রেখা স্বাভাবিক ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল। ১৯৭১-৭৫ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দুঃসময়। যুদ্ধোত্তর অরাজকতা সামাল দিয়ে পুনর্গঠনের ইস্পাত-কঠিন দৃঢ় মনোবল অসহযোগিতা, শত্রুতা ও অনভিজ্ঞতার মুখে দাঁড়াতে পারছিল না। ঠিক এ সময় ১৯৭৫ সালে সভ্যতার নৃশংসতম বর্বর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জাতীয় নেতৃত্বের স্তম্ভগুলো অপসারিত হয়। বাংলাদেশ বেতারের নামকরণ 'রেডিও বাংলাদেশ' এবং মুক্তিযুদ্ধের রক্ত-নাচা বিজয়-স্লোগান 'জয় বাংলা' 'জিন্দাবাদ' হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হয় ক্ষমতা দখলকারিগণ আমাদের গৌরবের ইতিহাস এবং অর্জনকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে বদ্ধপরিকর।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৫ সালের ৭ নবেম্বর খুনীদের নিজেদের মধ্যে আরও খুনোখুনি হয়। এ ভয়ার্ত সময়ে জনগণ অসহায়ের মতো ঘরে বসে ছিল। স্বাধীনতার অন্যতম জ্যোতিষ্ক জিয়াউর রহমান আরও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরের কাঁধে চেপে ক্ষমতায় এলেন ৭ নবেম্বর। জনগণ হাফ ছেড়ে বাঁচল। জিয়াকে মনে হলো যেন উদ্ধারকর্তা দেবদূত। সমর্থনের জনজোয়ার এলো। জিয়া ইতিহাসের উড়িয়ে দেয়া সেতুগুলো পুনর্নির্মাণ করলেন না। নেপোলিয়নের মতো তিনি মনে করলেন "রাষ্ট্র! আমিইত রাষ্ট্র।" জিয়া ইতিহাস বিকৃতি অনুমোদন করেই ক্ষান্ত থাকলেন না। তিনি জাতিসত্তার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তাকে বাংলাদেশী নামক পদার্থ বানিয়ে জনপ্রিয়তার সুযোগে বাজারজাত করে ফেললেন। জিয়া গংদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে সেনাপতি এরশাদ সমস্ত

বেলাল বেগ

রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাগুলো ঘুটিয়ে ঘুটিয়ে এমন এক 'খাবড়া' তৈরি করলেন যে তা আর মুখে দেয়া গেল না। ১৯৯০ সালে জনগণ এটাকে প্রত্যাখ্যান করল। ১৯৯১ সালে নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে জনগণ তাদের ইতিহাসকে আবার তার স্বকপথে স্থাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে বছর স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রণী রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী লীগ জয়ী হলে তা হতো সবচেয়ে স্বাভাবিক। দুর্জ্ঞেয় কারণে বিএনপি জয়ী হয়েছে। তবুও জনগণ আশা করেছিল স্বাধীনতার জীয়নকাঠি অবশ্যই তাদের স্পর্শ করবে।

১৯৯৬ সালে জনগণ বিএনপি'র জটিলতার কারণে বিএনপি বড় ধরনের আছাড় খেয়ে তার ঝুড়ির সব ক'টি ডিমই প্রায় ভেঙে ফেলে। একা আওয়ামী লীগ এ আছাড় দিতে পারলে রাজনীতির গোয়াল প্রায় পরিষ্কার হয়ে যেত। কিন্তু স্বাধীনতার এককালীন শত্রু জামায়াত এবং এরশাদের ন্যক্কারজনক স্বৈরাচার ভক্তগণ আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ইঁদুর-বেড়াল খেলার প্রবণতা জনসমক্ষে থেকেই গেল। তাই শতাধিক প্রাণ উৎসর্গ করে, বিপুল সম্পদ বিসর্জন দিয়ে দারুণ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে জনগণ সুষ্ঠুভাবে আরও একবার তার ইতিহাস সচল করার যে সুযোগ পেয়েছে তা আজও শঙ্কামুক্ত থাকল না।

ছাত্রদের কাজ সত্যানুসন্ধান, সঠিক জ্ঞানার্জন এবং সুষ্ঠুভাবে তার প্রয়োগ। সুতরাং ছাত্র রাজনীতির অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হচ্ছে রাজনীতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা লাভ এবং সে অনুযায়ী কিছু করা বা না করা।

পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা জানি না, তবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য একটা ছাত্র শাখা আছে। ঠিক এ কারণে ছাত্ররা একক অবিভক্ত সম্প্রদায় নয়, তারাও অন্তত ১০/১২টি ক্যাম্পে বিভক্ত।

এরা তাদের গুরুদের মন্ত্র কর্ণে-মস্তিষ্কে-হৃদয়ে বসিয়ে নিয়ে মন্ত-দেওয়ানা হয়ে এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে তাদের সামান্য ইশারা মাত্র ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়েস্ট স্টাইলে গুলি-বোমা নিয়ে মারণোৎসবে মেতে উঠতে পারে। ছাত্র কর্তৃক ছাত্র হত্যা, ছাত্রাবস্থায় পেশাদার খুনী হওয়ার অসংখ্য ঘটনায় 'ছাত্র' শব্দটিই এখন আতঙ্কের প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে ছাত্ররাই নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরা ধ্বংস করছে এবং সেই সঙ্গে ধ্বংস হচ্ছে দেশের ভবিষ্যত। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত না হলে অর্থনীতির উন্নয়ন কাঠামো গড়ে উঠবে না, কর্মসংস্থানেরও কোন ব্যবস্থা হবে না। কথাগুলো প্রকৃত ছাত্রদের হৃদয়ঙ্গম করতেই হবে নিজেদেরই ভবিষ্যত জীবনের স্বার্থে।

ছাত্ররা যদি ঠাণ্ডা মাথায় নিজেদের এবং দেশের কথা ভাবে তাহলে চরম দারিদ্র্যপীড়িত দেশটিতে তাদের অবস্থানের একটা মূল্যায়ন করতে তারা অবশ্যই সমর্থ হবে। বর্তমানে সামান্য পকেট খরচ এবং পিঠ চাপড়ানির বিনিময়ে ছাত্ররা রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের অমূল্য সময়, অমিত শ্রম এবং অসীম সাহসী পেশীশক্তি দান করে যাচ্ছে। তাদের ওপর ভর করেই ধাপ্পাবাজ রাজনীতিকরা নিজেদের আখের গোছাচ্ছে। জীবন গড়ার স্বপ্ন-সাধ, প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে প্রকৃত শিক্ষার সময় ও সুযোগ নষ্ট করে ছাত্রদের এবং সে সঙ্গে ভবিষ্যত নাগরিকদের পঙ্গু করছে যে রাজনীতি সেটি অভিশপ্ত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের প্রাক্কালে শিক্ষার হার ছিল অতি সামান্য। সে অন্ধকার যুগে জ্ঞান চর্চায় নিরতদের মধ্যে ছাত্র সম্প্রদায় ছিল বৃহত্তম। ফলে বয়স এবং বুদ্ধিমত্তার পরিপক্বতা না থাকা সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা ও মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের বিষয়গুলোতে ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবে জড়িয়ে যায়। বস্তুত তাদেরই অংশগ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা রক্ষা পায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী তার জাতিসত্তা আবিষ্কার করে। এরপর আন্দোলনের ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে ১৯৭১ সালে কৃত্রিম রাষ্ট্রব্যবস্থাটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। প্রকৃত বিচারে বাংলাদেশ এবং বাঙালী জাতির প্রতিষ্ঠা বাঙালী ছাত্রদেরই অবদান। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার হার ২৫%-এ উন্নীত হবার পরও ছাত্ররা স্কুল-কলেজে ফিরে যেতে পারেনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রমূলক অসুস্থ রাজনীতির জন্য। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে আরও একবার ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে দেশ থেকে স্বৈরাচারী শাসন উচ্ছেদ করার সংগ্রাম করে। গণতন্ত্র কায়েম হলে ছাত্ররা নিজেদের জীবন গঠনের স্বপ্ন-সাধের শিক্ষাঙ্গনে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু মানবপ্রেম ও দেশপ্রেম বিবর্জিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাত্রদের শিক্ষাঙ্গনে ফিরতে দেয়নি; বইয়ের পরিবর্তে ধরিয়েছে ফেন্সিডিল আর কলমের পরিবর্তে পিস্তল।

দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন, 'ওদের শায়েস্তা করতে আমার ছাত্রদলই যথেষ্ট' তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না ছাত্রদের তারা কি বানাতে চান। ১৯৯৬ সালে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার পুনরুদ্ধার এবং একটা নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠনের সুযোগ এসেছে। ছাত্রদের উচিত এ সুযোগ নিয়ে শেষবারের মতো দেশটাকে তার প্রকৃত ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারায় পুনর্প্রতিষ্ঠিত করে তার ভবিষ্যত চলার পথ নিশ্চিত করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়া। এ কাজটি ১৯৭২ সালে ঘটে গেলে হয়ত বাংলাদেশ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী 'টাইগার' হতে পারত। অতি উন্নত মানবিকতার সংস্কৃতি ও বহু শ্রেষ্ঠ শিল্প-দক্ষতার উত্তরাধিকার যাদের রক্তে আছে, তাদের জন্যে অলিম্পিক মশালের মতো আবার ছড়িয়ে পড়া অবশ্যই সম্ভব। ছাত্রদের মধ্যে যারা এখনও পড়াশোনা করে তারা নিজের আঙুল কেটে প্রমাণ দেবে কথাগুলো কত সত্য।

বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় বহুবার বদলেছে ইতিহাসের নদীপথে। সুতরাং দেশ মানে শুধু বিশেষ নামের ভূখণ্ড নয়। দেশ থাকে প্রতিটি মানুষের চেতনায়, তার অহঙ্কার-আত্মগরিমায়। যে মানুষটির বুকে স্বদেশের গর্ব, আনন্দ-দুঃখ-বেদনা বাজে না সে মানুষটি দেশে বাস করলেও দেশ তার কাছে একটি অসহ্য জঞ্জাল।

১৯৭৫ সালের পর ধর্মের আলখেল্লা পরে উন্নয়নের শিঙ্গা ফুঁকে বহুব্রীহি বহুপদী অর্ধপ্রকাশিত অর্ধগুপ্ত সামনে পিছনে চোখ যুক্ত একটি অদ্ভুত সিন্দাবাদী দৈত্য 'ধন-ধান্য পুষ্পভরা আমাদের এ বসুন্ধরা' বাংলাদেশের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। এ বীভৎস ভয়ঙ্কর দৈত্যটাকে দেশছাড়া করে সোনার ছেলেরা আবার স্কুল-কলেজে ফিরে যাবে এটাই দেশবাসীর শেষ প্রার্থনা।